জীবনমশায় মরেননি। দেবীপুরের খোড়ো কোঠাঘরের সেই 'আরোগ্য নিকেতন', তার সিমেন্ট - করা বারান্দায়, খাটো - পায়ার তক্তপোষে আজও যেন বসে আছেন জীবনবন্ধু মশায়। হেসে বলছেন, 'ওরে সেতাব, আর একবার দাবার ঘুঁটি সাজা। খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

১৯৫০ সালে নবগ্রাম থেকে দেবীপুরে যাওয়ার রাস্তার যে বর্ণনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন তাঁর আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে, তা নিশ্চয়ই বদলে গিয়েছে অনেক। সেই রাস্তা দিয়ে এখন আসে সকালের সাইকেল, খবরের কাগজ বোঝাই হয়ে। এই ২০০৬ সালের মার্চ মাসে নানা ইংরিজি দৈনিকে প্রকাশিত একটা খবর কি আর চোখে পড়েনি দেবীপুরের মানুষদের? সেই খবর বলছে, ব্রিটেনের কোনও ডাক্তার যদি রোগীর ইচ্ছে অনুসারে তাকে মরতে না দেন, তাহলে জেল হবে তাঁর। নতুন 'মেন্টাল ক্যাপাসিটি অ্যা*' পাশ হয়েছে সে দেশে। তাতে বলা হয়েছে, রোগী যদি জীবৎকালে 'লিভিং উইল' করে বলে গিয়ে থাকেন যে, তিনি কোনও কারণে চলচ্ছক্তিহীন, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে কৃত্রিম শ্বাস - প্রশ্বাস চালিয়ে, টিউবে করে তরল খাবার দিয়ে, তাকে যেন বাঁচিয়েনারাখা হয়, তবে সেই ইচ্ছে মানতে হবে। সেই নির্দেশ যদি ডাক্তার পালন না করেন, তাহলে তাঁর জেল পর্যন্ত হতে পারে। এমন আইনে নাকি ভারী রেগে গিয়েছেন বিলেতের ডাক্তাররা। তাঁরা বলেছেন, হিপোক্রেটিসের যে শপথ প্রতিটি ডাক্তারকে গ্রহণ করতে হয়, সেখানে যে বলা হয়েছে যে ডাক্তার যেন রোগীর কোনও ক্ষতি না করেন ('I will keep them from harm and injustice'), তার কী হবে? ফিলিপ হাওয়ার্ড নামে বড় এক ডাক্তার বলেছেন যে, তিনি বরং জেলে যেতে রাজি আছেন, কিন্তু রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবেন না। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন আইন অমান্য করলেডাক্তারদের পাশে দাঁড়াবে না সংগঠন। মৃত্যু নির্বাচনের অধিকারকে মেনে নিতে হবে। সোজা কথা, জীবন্মৃত রোগী মরবে না বাঁচবে,তা ঠিক করার অধিকার ডাক্তারের নেই। ফিলিপ হাওয়ার্ড চান আর না চান, আইনত তিনি সরে দাঁড়াতে বাধ্য। নিজে মৃত্যুতে সহায়তা করতে না চাইলে বড় জোর তিনি অন্য ডাক্তারের কাছে কেসটা পাঠিয়ে দিতে পারেন।

এ কথা শুনেই যেন অর্ধশতাব্দীর ওপার থেকে হাসছেন জীবনমশায়। যেন তামাক খাওয়া লালচে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলছেন, 'আমিও তো সেই কথাই বলেছি বাবা। পিঙ্গলকেশী, অন্ধ, বধির মৃত্যু যখন রোগীর শিয়রে দাঁড়ায়, তখন বৈদ্যকে তার পথ আড়াল করে দাঁড়াতে নেই। পথ ছেড়ে দিতে হয়। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে নিজের ছেলেকেও বাঁচানোর চেষ্টা আমি করিনা। তোমাদের হাসপাতালের প্রদ্যোত বোসের মতো ডাক্তাররা, তারাই তো বলেছিল, রোগীকে বাঁচানোই ডাক্তারের কাজ, মৃত্যুর পথ করে দেওয়া তার কাজ নয়। তার জন্যই এত ওষুধ, এত অস্ত্র। মতি কামারের বৃদ্ধা মায়ের নিদান হাঁকা নাকি অপরাধ, অন্য দেশ হলে এমন অপরাধে আমারে শাস্তি হত। এখন যে বিদেশে শাস্তি হাঁটছে উলটো পথে? পরমানন্দ মাধব হে!'

দুটি মানুষ, রোগী আর ডাক্তার। দুটি সম্ভাবনা, আরোগ্য আর মৃত্যু। এই চতুষ্কোণকে ঘিরে বারবার গড়ে উঠেছে অপূর্ব সব নকশা। কখনও স্থির নয়। সাধারণত ডাক্তার মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়ান। কখনও তাঁকে সরে যেতে হয় তাঁর সেই বিধিনির্দিষ্ট স্থানথেকে। নীতির (এথিকস) দৃষ্টিতে দেখলে, জীবন মশায় আর আজকের ব্রিটেনের কোনও ডাক্তারের সরে দাঁড়ানোর মধ্যে হয়তে খুববেশি পার্থক্য নেই। দুটি ক্ষেত্রেই মৃত্যুকে বরণীয় মনে করার কারণ, যন্ত্রণাময় জীবনকে অকারণে প্রলম্বিত না করা। দু-জনেই সরছেন মেডিক্যাল এথিকস বা চিকিৎসা নীতির নির্দেশে। কবিরাজ মশায়ের নীতি তাঁকে মৃত্যুকে স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে শান্ত ভাবে বরণ করতে শিখিয়েছে। চরক বলেছেন, মৈত্রী কারুণ্যমার্ত্তেষু শক্যে প্রীতিরুপেক্ষণং। প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবৃত্তিশ্চতুর্বিধা।' (চরক সংহিতা, নবম সূত্র)। যে আর্ত, যে ব্যাধিগ্রস্ত, তাকে করুণা করতে হবে, তার সঙ্গে মিত্রের মতো, বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হবে, যাতে রোগ আরোগ্য বিষয়ে তার আস্থা ফিরে আসে। যার রোগ চিকিৎসাসাধ্য, তার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু পঞ্চভূতোড়া এই দেহ যখন প্রাকৃতিক পঞ্চভূতে মিলিত হয়ে যায়, অর্থাৎ রোগী যদি মৃত্যুপথ যাত্রী হয়, রোগ যদি চিকিৎসাসাধ্য না হয়, তাহলে তাকে চিকিৎসক উপেক্ষা করবেন, তার আর কোনও চিকিৎসা করবেন না। জীবন মশায় তাই স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবেন। ব্রিটেনের ডাক্তার সরে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে পথ করে দেবেন, কারণ তাঁর দেশের আইনের সিদ্ধান্ত, জীবন্মৃত রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তার মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়ানোর অধিকার চিকিৎসাশাস্ত্রের নেই। নীতির নিরিখে তাই পঞ্চাশের দশকের বৃদ্ধ কবিরাজ আর এই ২০০৬ সালের ব্রিটেনের ডাক্তারের মধ্যে দূরত্ব কমে এসেছে, যেন বৃত্তের দুটি মুখ চলে এসেছে কাছাকাছি।

কিন্তু অপর এক দৃষ্টিতে এঁরা দু'জনে রয়েছেন দুই মেরুতে। মতির মা মরতে চায়নি। স্ফীত হাঁটুর ব্যথা নিয়ে বাঁচার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। জীবন মশায়ের কথায় আসন্ন মৃত্যুর আভাস পেয়ে বলেছিল, 'আমি তাহলে আর বাঁচব না?' জীবন মশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তাতেই বা তোমার দুঃখ কিসের গো। নাতিপুতি ছেলে বউ রেখে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে।' বলেছিলেন, কারণ নিজের মনে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, 'যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। হ্যাঁ মঙ্গল। নইলে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকবে না।' তাই সস্নেহে বলেছেন, যা ইচ্ছে খেয়ে নাও। জ্ঞানগঙ্গার ব্যবস্থা করো। এখানে ডাক্তার রোগীর বিষয়ে বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেসম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন, রোগীর নিজের বাঁচাবার আকাঙক্ষা, বা তার ছেলের চিকিৎসার আর্জি, আগ্রাহ্য করেছেন নিজের বিচারের, অভিজ্ঞতার এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে। এখানে চিকিৎসক যেন পিতা, যেন পিতার চেয়েও বড় কোনও অভিভাবক। যেন বিধাতাপুরুষের পরেই তাঁর স্থান।

তা বলে প্রাচীনরা সকলেই যে চিকিৎসককে বিনা প্রশ্নে গলায় কাপড় দিয়ে গড় করতেন, এমন নয়। সেই বিখ্যাত শ্লোক অনেকেরই মনে থাকবে, যেখানে বৈদ্যরাজকে যমরাজের সহোদর বলা হয়েছে, কারণ যম কেবল প্রাণ নিয়েই ক্ষান্ত হন, কিন্তু বৈদ্যরাজ ধন আর প্রাণ, দুটোর ওপরেই কব্জা করেন। চিকিৎসকের 'লার্নিং কার্ভ' ব্যাপারটাও রোগীদের অজানা ছিল না, 'শতং মারি ভবেৎ বৈদ্য, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।' তবু চিকিৎসকের কাছে আত্মসমর্পণই মোটের উপর রীতি ছিল। নেহাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর বরিশালের স্মৃতিকথা সেই কম্পাউন্ডার মশায়, যিনি দীর্ঘক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন 'হাঁটুতে ব্রেন নাই,' তাঁর মতো বিচক্ষণ না চলে চিকিৎসককে চ্যালেঞ্জ করার ঘটনা বিশেষ ঘটত বলে পাওয়া যায় না। মুঘল যুগের চিকিৎসকদের সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া যায়, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল যথেষ্ট। নবাবরা তাঁদের রীতিমত তোয়াজ করে চলেছেন, মনসব উপহার দিয়েছেন। চিকিৎসক নবাবের বিরাগভাজন হওয়ার পর আবার তাঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। এই চিকিৎসকরা চিকিৎসার বিশদ বিবরণ জানাতেন না রোগীকে। বিশেষত, কী ওষুধ দিচ্ছেন, তা সম্পূর্ণ গোপন রাখতেন। তবে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তার কারণ চিকিৎসকদের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখন ডাক্তাররাই ওষুধ বানাতেন, তাই ওষুধেরফর্মুলা ছিল 'ট্রেড সিক্রেট।' ধরে নিতেই হয়, চিকিৎসক - রোগীর মধ্যে অসুখ বা চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার পরিবেশ মুঘল আমলেগড়ে ওঠেনি। আকবরের এক সভাসদ, আবদুল কাদির বাড়ৌনি, যাঁকে আকবর মহাভারত অনুবাদের কাজে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি চিকিৎসানীতি নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। বড়ৌনির এই বইয়ের নাম নিজাতুর রশিদ (১৫৯০-৯১)। এখানে তিনি বলেছেন,, যদি রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হয়, তাহলে রোগীকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার দরকার নেই, তাকে জীবনের জন্য ব্যাকুল করে তোলার দরকার নেই। শেষ অবধি কেউই মৃত্যু রুখতে পারে না। কিন্তু ডাক্তারের কাজ হল তার নানা দক্ষতার সাহায্যে রোগী যাতে আরও এক বছর বাঁচে, তার ব্যবস্থা করা।

তবে রোগীর অধিকারের বিষয়টি যে মধ্যযুগের ডাক্তারদের ধারণার বাইরে ছিল, তা নয়, নবম শতাব্দীতে আল - রুওয়াহির 'আদাব আল - তাবিব' বইতে বলা হচ্ছে, চিকিৎসক শান্তভাবে রোগী এবং তার পরিবারের সকলের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তারাযদি দ্বিতীয় কোনও ডাক্তারের মতামত চায়, তাতে আপত্তি করবেন না। এবং সেই দ্বিতীয় মত যদি ভিন্ন হয়, তবে সিদ্ধান্তের ভার তিনি রোগীর উপরেই ছেড়ে দেবেন। এখানে রোগীর প্রয়োজন এবং পছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথাটি পাওয়া যায়, তবে চিকিৎসায় ডাক্তারের প্রাধান্যের বিষয়টি সে যুগে সন্দেহাতীত ছিল বলেই ধরে নিতে হবে।

পশ্চিমের চিকিৎসাধারায় 'মেডিক্যাল পেটার্নালিজমের' উৎস সেই গ্রীক ট্র্যাডিশনে। হিপোক্রেটিস ডাক্তারদের আচরণ বা'ডেকোরাম' - এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'রোগীর থেকে বেশির ভাগ জিনিসই লুকোবে, যখন তাকে পরীক্ষা করছ তখন যা করা হচ্ছে তার থেকে রোগীর মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবে, রোগীর ভবিষ্যৎ বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাকে কিছুই জানাবে না।' এ যে কেবল বাইরের নির্দেশ ছিল না, তা পরবর্তী কালে প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায়। তিনি লিখছেন, যে ভাবে ডাক্তাররা আমাদের নানা ভাবে ভুলিয়ে, এমনকী ভাঁওতা দিয়ে, কষ্টকর চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়, সে ভাবে যাঁরা প্রাজ্ঞ শাসক, তাঁরা প্রয়োজনে মনোহর মিথ্যা বলে আমাদের আনুগত্য আদায় করে নেবেন। মধ্যযুগেও হিপোক্রেটিসের তত্ত্বই চিকিৎসকদের প্রভাবিত করেছে। যদিও অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে যখন 'মেডিক্যাল এথিকস' নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি শুরু হল, তখন দেখা যাচ্ছে, রোগীকে ডাক্তার মিথ্যা বলতে পারে কি না, তা নিয়ে মতভেদ হচ্ছে। কেউ বলছেন, রোগীর স্বার্থে কখনও কখনও বলা যেতে পারে। অন্যরা বলছেন,ডাক্তারের মিথ্যা কখনওই রোগীর কাজে আসে

না।

তবে এমন কিছু প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও, পশ্চিমের চিকিৎসাপদ্ধতিতে ডাক্তার - রোগীর সম্পর্কেকে পিতা - পুত্রের সম্পর্খের আদলেই দেখা হয়ে এসেছে বারবার। যে সময়ে এসেছে রাষ্ট্রের কাছে, ধর্মের কাছে ব্যক্তি নাগরিকের আনুগত্য নিয়ে অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এমনকী যখন কোনও মতবাদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের ধারণা বাতিল হতে বসেছে, তখনও চিকিৎসকের কাছে রোগীর সম্পূর্ণ বশ্যতা বিষয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। বরং তার নিজের মতামত জাহির না করতেই বলা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তার 'এথিক্যাল কোড' -এ লিখছে, 'The obedience of a patient to the prescriptions of his physician should be prompt and implicit. He should never permit his own crude opinions as to their fitness, to influence his attention to them.'

প্রায় দেড় দশক লেগে গেল এ ধারণা বদলাতে। ১৯৯০ সালে ডাক্তার - রোগী সম্পর্ক বিষয়ে নীতির রূপরেখা দিতে গিয়ে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন লিখছে, 'The Patient has the right to make decisions regarding the health care that is recommended by his or her physician. Accordingly, patients may accept or refuse ay recommended medical treatment.' রোগীর অধিকারের এই ধারণাই রূপ পেয়েছে ব্রিটেনের নতুন আইনে। তার অনুসরণ করেই ফিলিপ হাওয়ার্ডের মতো ডাক্তারকেও রোগীর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর বিজ্ঞানের প্রয়োগ অথবা সংবরণ করতে হচ্ছে। জীবন মশায় রোগীকে পথ দেখিয়েছিলেন। আর এক রোগী পথ দেখাচ্ছে ডাক্তারকে। 'মেডিক্যাল পেটার্নালিজম' থেকে 'পেশেন্ট অটোনমি') রোগীর স্বাধিকার।

এই অধিকারের ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে সত্তরের দশক থেকে। ১৯৭২ সালে আমেরিকায় তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা রায় বেরোয়, যার প্রতিটিতেই রোগীর তথ্য জানার অধিকারকে সমর্থন করা হয়। এই সময়েই পরপর বেশ কয়েকটা ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়, যেখানে ডাক্তাররা রোগীদের সম্মতি না নিয়েই তাদের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করেছেন। তা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হয়, বই বার হয়। ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এগুলো 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' নয়। ডাক্তাররা রোগীদের সম্মতি না নিয়ে, অথব নামমাত্র সম্মতি নিয়ে, তাদের ব্যবহার করেছেন গবেষণার জন্য। ফলে রোগীর অধিকারের প্রশ্নটা খুব বড় আকার নিয়ে এসে দাঁড়ায় সমাজের সামনে। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হল 'আমেরিকান পেশেন্টস বিল অফ রাইটস।' সেখানে বলা হল, নিজের রোগের বিবরণ, চিকিৎসাপদ্ধতি এবং সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানার অধিকার রোগীর হয়েছে। তা এমন ভাষায় রোগীকে বলতে হবে, যাতে তার বোধার অসুবিধে না হয়। আশির দশকেই রোগীর স্বাধিকারের ধারণা চিকিৎসার এক মৌলিক দিক বলে মেনে নিলেন সকলে।

রোগীর স্বাধিকারের (পেশেন্ট অটোনামি) ধারণা বলে, রোগীকে বাধ্য সন্তান বলে চিন্তা করা চলে না, তিনি সাবালক, প্রাপ্তমনস্ক। বিশেষত যেখানে রোগী নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত নন, নিজের রোগ সম্পর্কে বই - ম্যাগাজিন পড়ে, ইন্টারনেট সার্চ করে, অন্য রোগীর সাথে কথা বলে, বেশ খানিকটা ধারণা তৈরি করার মতো ক্ষমতা তাঁর হয়েছে। রোগী আজ মনে করেন, ডাক্তার হওয়ার সুবাদে অপর একজন মানুষ আমার দেহ, আমার চিকিৎসা, আমার জীবন - মৃত্যু নিয়ে যা ইচ্ছে তা সিদ্ধান্তে নেবে, আর আমাকে ঘাড় কাত করে বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিতে হবে, এ কেমন কথা? কোন ওষুধ কেন খেতে হবে, কোন অপারেশনে কতটা ঝুঁকি, ওষুধে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে অপারেশনে যাব কেন, এমন সব প্রশ্নের আলোচনায় না গিয়ে, রোগীর মতামত না জেনে, ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেন কী করে? এমনও তো নয় যে ডাক্তার সর্বজ্ঞ। নানা মুনির নানা মত তো হরদম দেখা যাচ্ছে। বড় অপারেশনের আগে 'সেকেন্ড ওপিনিয়ন' নেওয়া এখন প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেহটা যখন আমার, ভুগতে যখন হচ্ছে আমাকে, আর টাকাও দিতে হবে আমাকে, তখন 'ডাক্তারবাবু আপনি যা ভাল বোঝেন' বলে ছেড়ে দিতেই বা যাব কেন? পিতৃতন্ত্রের ধারণা থেকে গোটা সমাজ যখন সরে এসেছে, সরে আসছে, তখন ডাক্তার রোগীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন সেই পুরনো ধারণা থেকে যাবে? ১৯৯৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদকীয়তে তাই লেখা হল, 'Benign and well intentioned it (paternalism) may be, but it has the effect of creating and maintaining an unhealthy dependency which is out of step with other currents in society.' ডাক্তারের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, মন যতই ভাল হোক তাঁর, রোগীকে যে ডাক্তারের উপর শিশুর মতো নির্ভরশীলহতে হবে, এই চাহিদাই আধুনিক সমাজের জীবনধারার সঙ্গে খাপ খায় না। সমাজের স্রোতগুলি ঠিক কী, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি সম্পাদক। কিন্তু অনুমান করা কঠিন হয় না, বিশেষত পশ্চিমের সমাজের ক্ষেত্রে, লিবারালিজ, র‍্যাশনালিজম আর ইন্ডিভিজুয়ালিজমের ধারণা আধুনিক সমাজদর্শনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যক্তি মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে না রাষ্ট্র কিংবা চার্চ, তার উপর জোর করে চাপাতে পারে না কোনও মতবাদ। নৈতিক আনুগত্যের দাবিও করতে পারে না। ব্যক্তির চিন্তার স্বাতন্ত্র্যকে, তার বাকস্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে হবে। রাষ্ট্রের কাজ, ব্যক্তির অধিকারকে রক্ষা করা। এই ভাবাদর্শ, এই চিন্তাধারা দুটি আন্দোলনের জন্ম দেয়, যা ডাক্তার রোগীর সম্পর্ককে পিতৃতন্ত্র থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে নিয়ে এসেছে। এক, ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলন। দুই, নারীবাদ।

ক্রেতা অধিকারের আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে ষাটের দশক থেকে। প্রধানত চারটি অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়, নিরাপত্তার অধিকার, তথ্যের অধিকার, বেছে নেওয়ার অধিকার এবং সুবিচার পাওয়ার অধিকার। আশির দশকে এসেছে দেখা যায়, প্রায় সব দেশেই ক্রেতার অধিকারের নিরাপত্তা নিয়ে আইন তৈরি হয়েছে (ভারতে ১৯৮৬ সালে,) যদিও ক্রেতাদের দলে রোগীদের ফেলা যায় কিনা, তা নিয়ে তুমুল তর্ক হয়েছে বহু দেশেই। তবে রোগীদের ক্রেতা সুরক্ষার অধীনে আনার মূল যুক্তি এটাই যে,যে পরিষেবা আমায় পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে, তাতে যদি গলদ থাকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আমার রয়েছে। এখানে ডাক্তার - রোগী সম্পর্ককে স্পষ্টতই যে কোনও ক্রেতা - বিক্রেতা সম্পর্কের ধাঁচে চিন্তা করা হচ্ছে। ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার সম্ভাবনা, রোগীর প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলার সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তৃত্বময় ডাক্তারের ধারণা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই সরে যেতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, কড়ি ফেলব, জিনিস বুঝে নেব - এই মনোভাব নিঃসন্দেহে পিতৃতন্ত্রের প্রশ্নহীন আনুগত্যকে বড়সড় ধাক্কা দেয়। রোগীর অধিকারের ধারণা গড়ে ওঠার ধারাবাহিকতায় ক্রেতা আন্দোলন তাই একটা প্রধান উপধারা।

ভাবতে ডাক্তারের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অধীনে আসেন ১৯৯৬ সালে। ডাক্তাররা এই আইনের বিরোধিতা করতে রাস্তায় আলু-পটল বেচেছিলেন, খবরের কাগজের পাতায় সে ছবি সহজে ভোলার নয়। ডাক্তারদের এই আন্দোলনের মজার দিকটা ছিল এই যে, তাঁরা রোগীর স্বাধিকারের ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েই ক্রেতা আইনের কবল থেকে গা বাঁচাতে চেয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের কাছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনে (ভি পিপ শান্তা বনাম আই এম এ, ১৯৯৫) বলা হয়েছে, প্রভু - গৃহভৃত্য সম্পর্ককে 'কনট্র্যা* অব পার্সোনাল সার্ভিস' বলে ক্রেতা সুরক্ষা আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার - রোগী সম্পর্কও প্রভু - গৃহভৃত্যের সম্পর্কের মতোই, কারণ রোগী ডাক্তারকে নিয়োগ করেন তাঁর ব্যক্তিগত পরিষেবার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এ যুক্তিমানেনি। বিচারপতিরা বলেন, গৃহভৃত্য প্রভুর ইচ্ছে মতো কাজ করে। ডাক্তার সেই অর্থে রোগীর ইচ্ছেমতো কাজ করে না,কারণ চিকিৎসার প্রকরণ থাকে ডাক্তারের হাতেই। ডাক্তাররাও পিতৃপ্রতিম বলে গৃহীত হতে চান না। তাই চিকিৎসক - রোগী সম্পর্ককে ব্যক্তিগতপরিষেবার চুক্তিতে টেনে আনা চলে না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলেই চিকিৎসাকে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অধীনে আনা গেল। দেখা যাচ্ছে, এই দিক - নির্ণয়ের ক্ষণটিতে ডাক্তার - রোগীর সম্পর্কের সনাতন বিরোধটি ভাবিয়েছিল বিচারপতিদেরও। পিতৃতন্ত্রে যে সমাজ আর আস্থা রাখতে পারছে না, এবং ডাক্তাররাও আর তার সুযোগ নিতে পারে না, এ কথাটা স্পষ্ট হয় এই মামলার রায় থেকে।

তবে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি অনেক সময়েই নজরের বাইরে থেকে যায় তা হল, ক্রেতা বা উপভোক্তা হিসেবে রোগীর ধারণাকে কেবল চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা করার অস্ত্র ভাবলে ভুল হয়। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগীরা নিজেদের স্বাস্থ্য পরিষেবার উপভোক্তা বা 'কনজিউমার' পরিচিতিকে কেন্দ্রে রেখে সামাজিক ন্যায়, পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার অধিকারের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় আমেরিকায় মানসিক রোগীদের আন্দোলন। বিংশ শতকের প্রথম থেকেই অমানুষিক চিকিৎসাপদ্ধতি, জোর করে হাসপাতালে ঢোকানো, ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠছিল। সত্তরের দশকে এসে দেখা যাচ্ছে, এই রোগীরা 'কনজিউমার' পরিচিতি নিয়ে আন্দোলন করছেন। আশির দশকে দুটি প্রধান সংগঠন পাশাপাশি কাজ করছিল - ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন্টাল পেশেন্টস, এবং ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। আজও মানসিক রোগীদের অধিকার এবং পরিষেবা নিয়ে কাজ করছে বেশ কিছু সংগঠন যারা নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উপভোক্তা বলে বর্ণনা করে।

দ্বিতীয় ধারা হল নারীবাদ। এই চিন্তাধারায় চিকিৎসায় পিতৃতন্ত্র সমাজ-রাষ্ট্র পরিবারের পিতৃতন্ত্রেরই একটা রূপ। একটা মেয়ের দেহের উপর যে তার নিজের অধিকার নেই, এই সত্যটা নারী আন্দোলনের একটা গোড়ার কথা, এবং সে কথা আজও সমানসত্য। মেয়েদের চিকিৎসার বিষয়ে নারীবাদের যুক্তি অবশ্য ব্যক্তি চিকিৎসককে ছাড়িয়ে পশ্চিমের চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই আক্রমড় করেছে। উনিশ শতকে ছেপে - বেরোন অ্যানাটমির বই থেকে শুরু করে আজকের সর্বাধুনিক বই, সর্বত্র মানবদেহের মাপ হচ্ছে পুরুষ দেহ। তুলনায় মেয়েদের নানা দেহাংশের উল্লেখ করা হয়েছে বারবার 'দুর্বল' 'ছোট', 'কম পরিণত', এমন ভাষায়। গোটা একটি মেয়েকেই একটি 'অপূর্ণ পুরুষ' হিসেবে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকের মেডিক্যাল পাঠ্য বইয়ে। মেয়েদের খুলিকে বেশ খানিকটা ছোটকরে আঁকা হত, যাতে বোঝা যায় যে তার বুদ্ধি নেহাতই কম। মাথার কসরত বেশি করলে যে গর্ভের ক্ষতি হতে পারে, এমন আশঙ্কাও বারবার করেছিলেন ডাক্তাররা। ক্রমশ দেখা গেল, মেয়েদের যে কোনও অসুখের পিছনেই ডাক্তাররা গর্ভাশয়ের বা ডিম্বাশয়ের কোনও সমস্যা খুঁজে পাচ্ছেন, ফলে সেগুলো কেটে বাদ দেওয়া প্রায়

রুটিন চিকিৎসা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল - সে মাথা ধরাই হোক, আরমানসিক সমস্যাই হোক। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে চিকিৎসকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর অযৌক্তিকতায় বারবার সরব হয়েছেন নারীবাদীরা। বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা, ডাক্তারের অভ্রান্ততার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, উপহাস করেছেন।

প্রসবের 'মেডিক্যালাইজেশনকেও' সমালোচনা করেছেন নারীবাদীরা। যা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, তাকে কোন অপারেশণ থিয়েটারে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে? কেন সক্রিয় জন্ম দেওয়া প্রক্রিয়াকে উৎসাহ না দিয়ে মাকে 'রোগী' বানিয়ে তার নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণকে উৎসাহ দেওয়া হবে? এখানে একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করতে হয়, যা সরাসরি চিকিৎসকের পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মেয়েদের স্বাস্থ্য আন্দোলনের সূচনা করেছিল। বইটির নাম 'আওয়ার বডিজ, আওয়ারসেলভস।' পুস্তিকার আকারে বেরিয়েছিল ১৯৭০ সালে। লিখেছিলেন বস্টন শহরের ১২টি মহিলা। তাঁরা কেউই ডাক্তার ছিলেন না, বরং মহিলা রোগীদের প্রতি ডাক্তারদের মনোভাবে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হয়ে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। লিখেছেন, 'We as women are redefining competence. A doctor who behaves in a male chauvinist way is not competent even if he has medical skills. We have decided that health can no longer be defined by an elite group of white, upper – middle – class men, It must be defined by us."

এখানে স্পষ্ট হয়ে যায়, চিকিৎসককে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দেখছেন লেখকরা (উচ্চমধ্যবিত্ত, শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ), আর নারী এবং রোগী হিসেবে নিজেদের সঙ্গে চিকিৎসকদের দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। চিকিৎসকের দক্ষতাই তাকে আধিপত্যের অধিকার দেয় না, কে সুস্থ কে অসুস্থ, তা নির্ধারণে ক্ষমতা দেয় না। সে ক্ষমতা এই অ- চিকিৎসক নারীরা (যদিও এরা সকলে ছিলেন শ্বেতাঙ্গ এবং কলেজ - পাশ) নিজেদের কাছে টেনে আনতে চাইছেন। চিকিৎসকের সর্বজ্ঞতাকে, এমনকী তার আত্মপরিচিতিকেও একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এই মেয়েরা। বিশ্বের ২০টির ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই বইটি, শেষ সংস্করণ বেরিয়েছে ২০০৫ সালে। সেই সংস্করণে অবস্য লিখেছেন অনেক চিকিৎসকও। কেবল নারী আন্দোলনে নয়, গোটা সমাজের চিন্তা বাঁক নেওয়ার কেটি মোড়ে মাইলপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বইটি।

এমন কিছু চিহ্নকে চেনা যায়, বাকি অসংখ্য মুখ, অসংখ্য কণ্ঠকে আলাদা করে বুঝে নেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁরা ছিলেন,তাঁরা কথা বলেছেন, তাই আজ রোগীর অধিকারের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিচ্ছেন চিকিৎসা মহল। ২০০২ সালে সিঙ্গাপুর মেডিক্যাল জার্নালে জে জে চিন লিখছেন, 'The pendulum has taken such a drastic swing that, with the exception perhaps of soft weak paternalism in the case of non – autonomous patients, paternalism is almost always perceived in negative light, regardless of intention and outcome.

কিন্তু এ তো সমস্যার শেষ নয়, এ যে আরেক সমস্যার শুরু। ডাক্তার যদি নেহাত নিস্পৃহ ভাবে 'এ-ও হয়, ও-ও হয়,' বলে রোগীর ঘাড়ে সিদ্ধান্তের দায় চাপিয়ে কাজ সারেন, তাতে কি যথার্থ চিকিৎসা বলা চলে? চিকিৎসক সেখানে তাঁর পেশাদারি নীতিকি মেনে চলেছেন, না তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন? আর তার চেয়েও বড় কথা, রোগী যে তার নিজের সম্পর্কে ঠিক সিদ্ধান্ত নেবে, এমন মনে করারই বা কারণ কি? চিন বলছেন। রোগী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম কি না, তা বুঝতে কেবল দেখা হয় রোগী মানসিক ভাবে সুস্থ কি না। কিন্তু যেখানে রোগ আর তার চিকিৎসা খুব জটিল, কিংবা যেখানে রোগীর আবেগ কাজ করছে, সেখানে রোগী কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে? সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কতখানি উপযুক্ত সে? যদি চিকিৎসা হয় অত্যন্ত যন্ত্রণার, কিংবা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, আর সেই কারণে রোগী তা নিয়ে অস্বীকৃত হন, ডাক্তার কি তা চুপচাপ মেনে নেবেন? অথচ এখন চিকিৎসার যা পরিবেশ, তাতে রোগীকে মত বদলানোর জন্য অনুরোধ করাটাও তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে ধরা যেতে পারে, বলছেন চিন। আরও সমস্যা, 'পেশেন্টঅটোনমি'-র যে মডেল, (অনেক এক 'ইনফর্মড মডেল' বলেন) তাতে রোগীর বেছে নেওয়ার অধিকার আছে, স্বাধীনতা আছে, কিন্তু চিকিৎসার ফলাফলের নৈতিক দায়িত্ব রোগীর উপর বর্তায় না। (ক্রেতার মডেলে রোগীকে চিন্তা করার অন্যতম সমস্যা এখানে)। ডাক্তার সতত উদ্ধত, সতত আধিপত্য - অভিলাষী, প্রায়ই অমানবিক, আর রোগীমাত্রই দায়িত্বশীল, যুক্তিবাদী, স্থিরমতি, এমন একটা ছবি চিন্তা করে একটা সম্পর্কের মডেল খাড়া করতে চাইলে বড়সড় খামতি থেকে যেতে বাধ্য।

মনে হতে পারে, এ তর্ক স্রেফ তাত্ত্বিক। যে ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করছেন, আর যাঁরা রোগী হয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, তাঁরা দু'পক্ষই জানেন যে এখন কেবল ডাক্তারের কথা, অথবা কেবল রোগীর কথায় চিকিৎসা হয় না। সরকারি হাসপাতালের আউটডোরের মতো কিছু পরিস্থিতি বাদ দিলে, বেশির ভাগ সময়েই ডাক্তার আর রোগীর একটা আলোচনা হয়। কিছু প্রশ্নের উত্তর ডাক্তার দেন, কিছু সিদ্ধান্ত রোগীকে নিতে হয়, কিছু ছেড়ে দিতে হয় ডাক্তারের উপর। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে ফিরে দেখলে বোঝা যায়,তা নয়, কত কুড়ি - পঁচিশ বছর ধরে সমাজে এই বাদ - প্রতিবাদের সংঘাতটা চলছে বলেই ডাক্তাররা আজ রোগীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক বেশি সময় দিচ্ছেন, তাঁদের মতামত নিয়ে বিশেষত তাঁদের সম্মতি নিয়ে, মাথা ঘামাচ্ছেন অনেক বেশি। অন্য দিকে, রোগীরাও অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন স্বাস্থ্যনিয়ে। পরিমিত খাওয়াদাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম, ধূপপান কমানো, হেলমেট বা সিটবেল্টের মতো সাবধানতা নেওয়া এই ধরনের উদ্যোগ বেড়েছে। বেড়েছে মিডিয়াতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা এবং উপদেশের বহর,ইন্টারনেট স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রশ্ন - উত্তরের নানা ওয়েবসাইট। রোগীর কাছে তাঁর রোগের 'লেটেস্ট ট্রিটমেন্ট' বিষয়ে রীতিমত ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে, এমন একটা কৌতুক - মেশানো - অভিযোগ মাঝেমাঝেই শোনা যায় ডাক্তারদের আলোচনা।

এখন তাই ডাক্তারের আধিপত্য আর রোগীর অধিকার, দুয়ের মাঝে একটা মধ্যপন্থা খুঁজছেন সকলে। যে কথাটা সবচেয়েবেশি উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে, তা হল 'পার্টনারশিপ'। অংশীদারিত্বের ধারণার সুবিধে এই যে, যে কোনও সিদ্ধান্তের দায় দু'জনের উপরেই বর্তায়। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে অ্যাঞ্জেলা কুন্টর লিখছেন ১৯৯৯ সালে, সার্থক ডাক্তার - রোগী সম্পর্ক তখনই তৈরিহয়, যখন দু'জনেই দু'জনকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকার করেন। ডাক্তার রোগের কারণ, রোগ নির্ণয়ের উপায়, এড়ানোর উপায়, চিকিৎসার কী কী পদ্ধতি রয়েছে, সে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু রোগীই কেবল বলতে পারেন তাঁর অসুস্থতার অভিজ্ঞতা কেমন, তাঁরসামাজিক অবস্থান কী, তাঁর নিজের দৈনন্দিন অভ্যাস, আচার - ব্যবহার কেমন, কী ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাঁর, কী তাঁর পছন্দ - অপছন্দ। এই দুই বিষয়ের ধারণা একত্র বিচার করা হলে তবেই একটি অসুখ সারতে পারে। তাই আলোচনা করা, এবংএকসঙ্গে সিদ্ধান্তে আসা, এত জরুরি। ডাক্তার - রোগীর এই 'পার্টনারশিপ মডেল' বা 'শেয়ারড মডেল' স্বাস্থ্যনীতিতে গৃহীত হলে ক্রেতা সুরক্ষা মডেলের ফ্যাসাদগুলোর পাশ কাটানো যাবে, এমনও আশা করা হচ্ছে। পার্টনারশিপের ধারণাতেও যে নানা প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়। কোনও তত্য, কোন সিদ্ধান্ত কতখানি 'শেয়ার' করবেন, কোনটার জন্য কে কতটা দায়ী থাকবেন, এর কোনও রূপরেখাআজও তৈরি হয়নি। তবু মোটের উপর এ যে মন্দের ভাল, তা মেনে নিচ্ছেন প্রায় সকলেই।

এমন একটা কথায় এসে যদি আলোচনার ইতি টানা যায়, তাহলে বেশ হয়। 'সস্তা ভাল দামীও ভাল, তুমিও ভাল আমিও ভাল,' এমন একটা জায়গায় কথাবার্তা শেষ করাটাই ভদ্র দস্তুর। কিন্তু ডাক্তার - রোগীর সম্পর্ক অমন সরল নয়। এ সম্পর্ক ক্ষমতার বৈষম্যের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িপাল্লায় ডাক্তারের দিক সব সময়েই ভারী। যদি কেবল জ্ঞানের, দক্ষতার কি অভিজ্ঞতার আধিক্যের কারণেই সেই পাল্লা ভারী হয়, তাহলে রোগীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে সম্পর্কে সমতা আনার কথা ভাবাযেতে পারে। কিন্তু সত্যটা কি তাই? ডাক্তার রোগের কারণ আর প্রতিকার সম্পর্কে জানে, রোগী জানে না - অন্তত অতটা জানে না, কেবল এই বেশি - কমের মধ্যে কি লুকিয়ে রয়েছে বৈষম্যের হেতু? নাকি সমাজের আরও গভীরে প্রোথিত, অন্য কোনও নকসার উপর ভিত্তি করে রচনা হচ্ছে ডাক্তার - রোগীর সম্পর্ক?

ডাক্তার - রোগী সম্পর্ক নিয়ে প্রথম একটা থিওরি খাড়া করেছিলেন যিনি, সেই ট্যালকট পার্সনসের মতো ডাক্তারের আধিপত্যের উৎস তার প্রেসক্রিপসন লেখা ক্ষমতা নয়, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট লেখার অধিকার। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক জুড়ে যে মতবাদটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা হল এ রকম প্রতিটি মানুষেরই সমাজে নিজস্ফকিছু কাজ আছে, কিছু দায়িত্ব আছে, যা সমাজে তার ভূমিকাটি নির্দিষ্ট করে দেয়। এই কাজের দায়ত্ব থেকে সমাজ ব্যক্তিকে সহজে অব্যাহতি দেয় না, কারণ তাহলে সমাজের চলিতব্যবস্থার খেলাপ করা হয়। একজন মানুষের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি সমাজ মেনে নেয় শুধু যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কর্মীর ভূমিকা থেকে যখন সে রোগীর ভূমিকা নিচ্ছে। অর্থাৎ এই দৃষ্টিতে রোগী 'অস্বাভাবিক', রোগ 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' অসুস্থতা ব্যাপারটাই সমাজের সুব্যবস্থার পরিপন্থী। সমাজের বাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম তৈরি করছে রোগী। তাই তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনও মানুষ সত্যিই রোগী, নাকি রোগের ভান করে সমাজের দায়িত্বগুলি থেকে সে অব্যাহতি চাইছে, তা ঠিক করে ডাক্তার। অর্থাৎ ডাক্তারই স্থির করছে, সমাজে কোনটা 'স্বাভাবিক,' আর কোনটা 'ব্যতিক্রম' - যা একসময় ঠিক করত চার্চ। এটা কেবল ডাক্তারের দক্ষতার প্রশ্ন নয়, এটা তার নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্ন। এখানে তিনি সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক,নির্ধারক।

পার্সনসের 'ফাংশানালিজম' -এর দৃষ্টিতে রোগী ডাক্তারের কাছে আবেদনকারী - তার রোগ যে যথার্থ, সামাজিক দায়িত্ব পালন না - করার অপরাধে সে যে অপরাধী নয়, তা বলে দেবেন ডাক্তার। রোগীর অসামর্থ্যকে তিনি বৈধতা দেবেন। ফলে পার্সনসের চোখে ডাক্তার আর রোগী কোনও দিনই এক উচ্চতার চেয়ারে বসতে পারে না। আর রোগী তা চায়ও না। পার্সনসের যুক্তি, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ভূমিকা পালন করতে না পেরে রোগী মনে মনে তার শৈশবের নির্ভরতার দিনে ফিরে যায়। জেনেশুনে, কিংবা নিজের অজান্তে, সে ডাক্তারের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। তার ভয়, তার উৎকণ্ঠা, সব ডাক্তারের ঘাড়ে চাপিয়ে সে মুক্তহচ্চোয়, নিশ্চিন্ত হতে চায়। ডাক্তার এই আস্থার সদ্ব্যবহার করেন রোগীকে ভাল করে তোলার উদ্দেশ্যে, যতদিন না রোগী সুস্থ হয়ে আবার তার সমাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়, প্রত্যাশিত কাজগুলি আবার করতে শুরু করে। এই দৃষ্টিতেই তার ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে ক্ষমতার

ভারসাম্যহীনতাই কাম্য, সেটাই স্বাভাবিক।

মার্ক্সবাদীরাও 'নিয়ন্ত্রক' ডাক্তার এবং 'নিয়ন্ত্রিত' রোগীর ধারণায় বিশ্বাস করেন, ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে ক্ষমতার এই পার্থক্যের উপর জোর দেন। কিন্তু পার্সনস যেখানে রোগীর নির্ভরতাকে, ডাক্তারের ক্ষমতাকে অভিপ্রেত মনে করেছেন, মার্ক্সবাদীরা সেখানে তাকে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের মতে, ডাক্তার ও রোগীদের ক্ষমতার এই তারতম্য সমাজের ধনী - দরিদ্রের বৈষম্যের প্রকাশ। সে বৈষম্য টিকিয়ে রাখার জন্যই ডাক্তাররা রোগের সেই সমাজগত দিকটির থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেন, জোর দেন কেবল মেডিক্যাল কারণগুলির উপর।তাঁদের কাছে রোগের কারণ হয় জীবাণু, নইলে 'লাইফস্টাইল'। গরিব মানুষের অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর বাড়িঘর, অপরিশ্রুত জল, এগুলো কারণ নয়। অস্বাস্থ্যের থেকে রাজনীতিকে দূরের রাখার কাজটা করে ডাক্তার। ডাক্তারের কাজ, রোগকে ব্যক্তির স্তরে টেনে নিয়ে আসা। তাই আমরা যখন আর্থ - সামাজিক চাপে অবসাদে ভুগি, তখন ডাক্তার আমাদের যোগব্যায়াম করার, মেডিটেশন করার উপদেশ দেন, মুড ভাল করার ওষুধ দেন। রোগের উপসর্গই বড় হয়ে ওঠে, রোগের উৎস থেকে যায় আড়ালে।

রোগের চিকিৎসা করতে গিয়েও ডাক্তাররা মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা বলেন না। বলেন কেবল ওষুধ খাওয়ার কথা, যার অর্থ ওষুধের বাজার তৈরি করা। 'ফাংশানালিস্ট - দের মতো মার্ক্সবাদীরাও বলবেন, ডাক্তার স্থির করেন কোন রোগীকাজে ফিরে যেতে সমর্থ, আর কে নয়। কিন্তু তাঁদের মতে ডাক্তারের এই ক্ষমতা তাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগী করে তুলছে, কারণ সুস্থ থাকাকে এখানে কাজ করার ক্ষমতার সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে। সেই সুস্থ, সেই স্বাভাবিক, যে উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে। এভাবেই রাষ্ট্রের, পুঁজিবাদের সমর্থন করছেন ডাক্তাররা। আর রাষ্ট্রও তাঁদের সমর্থন করে চলেছে, কারণ রাষ্ট্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপরএকটা 'মনোপলি' বা একচ্ছত্র অধিকার তৈরি করে রেখেছে। মেডিক্যাল কলেজে কারা ঢুকবে, কী শর্তে ঢুকবে, কতজন ডাক্তার বেরোবে, তা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করে। চিকিৎসার জ্ঞানের উপর রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণই ডাক্তারদের ক্ষমতার উৎস। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বিষয়ে যাতে প্রশ্ন না ওঠে, সেই জন্যই ডাক্তারের উপর আস্থা রাখার কথাটা এত জোর দিয়ে বলা হয়।

মিশেল ফুকো বলছেন, ডাক্তার রোগীর উদ্ধারকর্তা, আর ডাক্তার রোগীর প্রতিদ্বন্দ্বী, এই দুই ধারণার মূলেই রয়েছে দুটি 'গ্রেট মিথ'। 'বার্থ অফ দ্য ক্লিনিক' বইয়ে তিনি লিখছেন, ফরাসি বিপ্লবের পর রাজা এবং চার্চ যে জমি ছেড়ে দেয়। তা দখল করে চিকিৎসক। তার কারণ, বিপ্লবের পর দুটি ধারণা জন্ম নেয়। এক, চার্চের ফাদাররা যেমনভাবে মানুষের আত্মার মুক্তির জন্য কাজ করত, তেমনই ডাক্তাররা মানুষের দেহের বেদনার উপশম করবেন। পুরোহিতরা যেমন কোনও ফি নেন না, তেমনই ডাক্তাররাও রোগীরথেকে টাকা না নিয়ে তাদের চিকিৎসা করবেন। ডাক্তারদের টাকা দেবে সরকার, তৈরি হবে একটা জাতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এ ভাবেটাকার চিন্তা, লাভের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ডাক্তাররা নিঃস্বার্থ ভাবে রোগীর সেবা করবেন। তার ফলে চড়চড় করে উন্নতি হবে মেডিক্যাল সায়েন্সের। 'ফাংসানালজিম' যদিও সরাসরি এমন কোনও ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি, কিন্তু একটু ভাবলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে পার্সনসের চিন্তার যে একমাত্রিকতা - রোগী যন্ত্রণামুক্ত হতে চাইছে এবং ডাক্তার তাকে যন্ত্রণামুক্ত করতে চাইছে, দু'জনের ঐকমত্যে চিকিৎসা চলছে - তা এই ধরনের সরল সমাজদর্শনের উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে ডাক্তার - রোগীর সম্পর্কে যতই সহযোগিতা দেখা যাক, সামাজিকস্তরে তাদের মধ্যে যে সংঘাত থাকতে পারে, থাকা অবশ্যম্ভাবী, তা পার্সনসের সময়ে, অর্থাৎ সেই পঞ্চাশের দশকে, হয়তো তেমনভাবে অনুভূত হয়নি। তখনও মার্কসবাদ, নারীবাদ, সমাজ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন তুলে অস্থিরতা জন্মায়নি। তাই ডাক্তারকে 'থেরাপিউটিক ক্লার্জি'-র ভূমিমায় চিন্তা করাটা ষোড়শ শতকের ফ্রান্সে যেমন স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, তেমনই মনে হয়েছে পঞ্চাশের আমেরিকায়।

কিন্তু মার্ক্সবাদীরা যে ভাবে চিন্তা করেন চিকিৎসার কথা, তার মূলে রয়েছে দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা, বা 'মিথ।' ফুকো বলছেন তা হল এই রকম - যদি সমাজে শ্রেণী বৈষম্য না থাকে, ধনীর বিলাসিতা দূর হয়, দরিদ্রের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উন্নতি হয়, যদি যুদ্ধ না থাকে, হিংসা না থাকে, আলস্য না থাকে, তাদের অসুখও থাকবে না। এমন 'আদর্শ' সমাজে চিকিৎসক ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। যে ভাবে সমাজ রাজারাজড়াদের জাঁকজমকের কাহিনী ক্রমশ ভুলতে বসেছে, কেবল তার ক্ষীণ স্মৃতি মনে রয়েছে, সেই বাবে ভুলে যাবে ডাক্তারদেরও। যে ভাবে নিজেদের দাসত্বের দিন স্মৃতি হয়ে হয়ে যাবে, সেই ভাবে স্মৃতি হয়ে যাবে অসুস্থতাও

এই দুটো ধারণাই পুকোর মতো অতি - সরলীকরণ, স্রেফ দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরপর তৈরি হওয়া এই দুই ধারণাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে অল্প দিনের মধ্যে। কিন্তু এই ধারণাগুলি একটা কাজও করে গিয়েছে। চিকিৎসা যে কেবল রোগ সারানোর দক্ষতা নয়, তা যে মানুষের পক্ষে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কী ঠিক, কী বেঠিক তা স্থির করার ক্ষমতা রাখে, তা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে। এটাই চিকিৎসককে সামাজিক এবং নৈতিক ক্ষমতা দিয়েছে। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে, সামাজিক জীব হিসেবে, মানুষের কী করা উচিত, তা নির্ধারণ করতে পারেন ডাক্তার। ব্যক্তি মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি যেখানে মিশছে জাতির জীবনের যথাযথ বিন্যাসে - তার শ্রমিকের কর্মে, সেনাবাহিনীর বীর্যে, মানুষের উৎপাদনক্ষমতায়, সেই সীমান্তবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন চিকিৎসক এই জন্যই আধুনিক সমাজে চিকিৎসক 'দক্ষ' থেকে 'বিজ্ঞ' 'প্রজ্ঞাবান' হয়ে উঠলেন। সমাজে তাঁর আধিপত্যের মূল এইখানে।

ফুকোর অনুগামী গবেষকরা মার্ক্সবাদীদের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁরা ডাক্তার রোগীর সম্পর্কটা বাইরে থেকে দেখছেন বলেই ডাক্তারের আধিপত্যটা তাঁদের বেশি চোখে পড়ছে। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চিকিৎসা ব্যবস্থাই এমন একটা পরিকাঠামো তৈরি করে রেখেছে, যেখানে রোগী স্বেচ্ছায় তার শর্তগুলি মেনে নেয়। কী সেই পরিকাঠামো? ফুকোর অনুগামীরা বলবেন, তা হল 'ক্লিনিক্যাল একজামিনেশন।' ডাক্তার যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করছেন, নানা বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করছেন, রোগী যে স্বেচ্ছায় নিজের দেহকে একটা 'বস্তু' হিসেবে ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে, এই পুরো ব্যাপারটাই রোগীকে, এবং সামগ্রিক ভাবে সকলকেই, একটা বিশেষ নিয়মের অংশীদার করে দেয়। ফুকোর অনুগামী ডেভিড আর্মস্ট্রং লিখছেন, 'See the routine clinical techniques : the rash displayed, the hand applied to the abdomen, the stethoscope placed gently on the chest. This is the stuff of power. Trivial perhaps but repetitive, strategies to which the whole population at times must yield.' ফুকোর চিন্তা শেষ অবধি খানিকটা পার্সনসের চিন্তার কাছাকাছি যায়, কারণ ডাক্তার - রোগী সংঘাতের চাইতে তাদের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলে। ফুকোর দৃষ্টিতে এই সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী, কারণ যে ভাবে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার শর্তই হল রোগী বশ্যতা। রোগীর ক্ষমতায়নের ধারণা এখানে কাজ করবে না, কারণ ক্ষমতার এই অসাম্য এত সূক্ষ্ম, এমন সর্বব্যাপী, যে রোগী তা আত্মস্থ করে ফেলেছে। সে নিজের শরীরকে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে দেখতে, যাচাই করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

পুকো তাঁর শেষ দিকে লেখায় রোগীর শরীরকে কেবল চিকিৎসকের পরীক্ষার 'বস্তু' হিসেবে চিন্তা করা থেকে সরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, রোগীর শরীর শেষ অবধি ক্ষমতার সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তবে ফুকোর উত্তর আধুনিক চিন্তার জটিল পথে না হেঁটে যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ডাক্তার - রোগী সম্পর্ককে চিন্তা করতে হয়, তাহলে বলতেই হয় যে গত এক দশকে ডাক্তার - রোগী সংঘাতের ধারণা আরও তীব্র হচ্ছে। একটা গভীর সন্দেহের মেঘ যেন গোটা আকাশকে দখল করে নিচ্ছে, ফলে সৌহার্দ্যের স্বাভাবিক উত্তাপ, এমনকী মানবিকতার উষ্ণতাটুকুও যেন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। রোগ ভাল হওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক্তার রোগীর সহযোগিতার যে কথা বলেছেন পার্সনস বা ফুকো, তার পথ রোধ করেও যেন দাঁড়াচ্ছে সামাজিক সংঘাত। প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন জাগছে রোগীর মনে, ডাক্তার কার দলে? রোগীর দলে, নাকি ওষুধ কোম্পানির দলে? এ সংকট স্বীকার করেন চিকিৎসকমহলও। ২০০৩ সালের মে মাসের ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের মলাটে দেখানো হয়েছিল সাদা এপ্রন পরা শুয়োরদের, যারা মস্ত একটা খাবার টেবিলের চারপাশে বসে গোগ্রাসে খাচ্ছে। ওই শুয়োর-রূপী ডাক্তারদের খাওয়াচ্ছে ভোঁদড় রূপী সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভরা। ওই সংখায় যে ময়নিহান নামে এক সাংবাদিক বেশ কয়েকটি দেশের সমীক্ষার ফল থেকে দেখিয়েছিলেন, প্রায় ৯০ শতাংশ ডাক্তার নিয়মিত ওষুধ কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের সঙ্গে দেখা করেন, বেশির ভাগই তাদের থেকে নানা উপহার নেন, অথচ অধিকাংশই দাবি করেন, তাঁদের ওষুধ লেখার উপর সে সব উপহারের কোনও প্রভাব নেই। সমীক্ষায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডাক্তাররা নতুন ওষুধ লিখছেন বেশি, যার ফলাফল এখনও প্রমাণিত হয়নি। 'জেনেরিক' ওষুধ লেখার চল কমে আসছে, ব্রান্ডের নাম লেখার প্রবণতা বাড়ছে, এলোপাথাড়ি ওষুধ প্রেসক্রাইব করা বেড়ে চলেছে। সেমিনারে যাওয়ার টিকিট, হোটেলে থাকার খরচ, ডাক্তারদের সংগঠন চালানোর খরচ, জার্নাল প্রকাশের খরচ, সবই দিচ্ছে ওষুধ কোম্পানি। আমেরিকাতে দেখা যাচ্ছে, বছরে প্রায় তিন লক্ষ আলোচনাসভা স্পনসর করছে কোম্পানিগুলো। আরও চিন্তার কথা, ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণার টাকা জোগাচ্ছে কোম্পানি, আর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে সেই সব রিসার্চে ওষুধের উৎকর্ষ প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জার্নল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি এডিটর ড্রামন্ড রেনি বলেছেন, ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে উপহার পাওয়াটা ডাক্তাররা আর ঘুষ বলে মনে করছেন না, মনে করছেন এটা তাঁদের ন্যায্য পাওনা। ময়নাহান লিখছেন,' The flip side of this sense of entitlement is of course indebtedness, which, … is to be repaid by support for the patron's drugs, with a sense of obligation in direct conflict with doctor's primary obligations to their patients.

এদেশে এমন কোনও বড় মাপোর সমীক্ষা হয়নি। না হোক, তবু পশ্চিমের প্রতিটি কথা এখানে সত্যি, হয়তো আরও বেশি, আরও রূঢ় ভাবে সত্যি। সোজা কথা, ডাক্তার আর রোগীর সম্পর্কের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে ওষুধ কোম্পানি। এতেই শেষ নয়। রয়েছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পেসমেকার প্রভৃতি সার্জারির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, এবং সর্বোপরি বিমা কোম্পানি। এতগুলো ইঁদুরে যদিকেটে যায় শিকড়, তবে বিশ্বাস দাঁড়ায় কোন জমিতে? ডাক্তার ওষুধ কোম্পানির লাভের কথা ভেবে ওষুধ দিচ্ছেন, না রোগীর দ্রুত আরোগ্যের কথা ভেবে

ওষুধ দিচ্ছেন, তাঁর মূল রোজগার রোগীর সম্মানদক্ষিণা না দালালির অর্থ, এই প্রশ্ন সহস্রাব্দী - প্রাচীন আস্থা - মহীরুহকেও ভূপাতিত করতে বাধ্য। পিতৃতন্ত্র ছেড়ে নয় অংশিদারিত্বে আসা গেল, কিন্তু ডাক্তারের এক হাত যদি ঢুকে থাকে অদৃশ্যনানা পকেটে, তাহলে অন্য হাতে রোগীর হাত ধরলেও তা কি 'পার্টনারশিপ' হয়? রোগী যখন গোড়াতেই হেরে বসে আছে এই বিপণনের খেলায়, তখন তার অধিকারের কথাটাই তো প্রহসনে দাঁড়িয়ে যায়! সেই সঙ্গে রয়েছে ডাক্তারদের সংগঠনগুলির হ্রস্বদৃষ্টি। উন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বারবার প্রমাণ করে যে, সামাজিক যে সমস্যাগুলি ঘিরে ডাক্তার - রোগী বিরোধ গড়ে উঠছে, তার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা, তা নিয়ে আলাপ - আলোচনা, বিতর্ক, কোনও কিছু নিয়েই তাঁদের মাথাব্যথা নেই। এঁদের একমাত্র কাজ চাঁদা - দেওয়া সদস্য ডাক্তারের পাশে দাঁড়ানো। রোগী যাতে যথাযথ চিকিৎসা পায়, প্রতারিত না হয়, হয়রান না হয়, তার জন্য চিকিৎসাব্যবস্থা, বিমা ব্যবস্থা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সবকটিরই সংস্কার এবং উন্নতি প্রয়োজন। সেকথা ব্যক্তিগত আলোচনায় ডাক্তাররাও বারবার বলেন। কিন্তু ডাক্তারদের সংগঠনগুলি কোনও দিন এ বিষয়গুলিতে কোনও কথাউচ্চারণ করে না। বরং দেখা যায়, সংস্কারধর্মী যে কোনও উদ্যোগের বিরোধিতা করছেন তাঁরা। কনজিউমার্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট থেকে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যা*, সর্বত্রই সেই এক দৃশ্য।

এ কথাটা বুঝতে পারছেন রোগীরাও, তাই সম্মিলিত প্রতিবাদের মঞ্চ গড়ে উঠছে। ভারতের নানা জায়গায় রোগীদের সংগঠন গড়ে উঠছে। এর মধ্যে কয়েকটি সরাসরি ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মামলায় সহায়তা করছে, যেমন কলকাতার 'পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্ট।' এডস রোগীদের সংগঠনগুলি একত্রে গ্ল্যাক্সো স্মিথক্লিনের 'কমবিভির' ওষুধটির পেটেন্টের আবেদনের বিরোধিতা করছে। রোগীদের দাবি, এটি নতুন ওষুধ নয়, দুটি পুরনো ওষুধের মিশ্রণ। তাই পেটেন্ট নিয়ে দাম বাড়ানো চলবে না। ক্যান্সার রোগীদের সংগঠন বিরোধিতা করেছিল নোভার্টিসের ওষুধ 'গ্লিভেক' -এর পেটেন্ট আবেদনের, কারণ এটি একটি পুরনো ওষুধও নতুন নামে চালানোর চেষ্টা চলছিল। আদালত পেটেন্টের আবেদন বাতিল করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য হর্মোনভিত্তিক ড্রাগ ডিপো প্রভেরা জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে আনার বিরোধিতা করে সফল হয়েছে নারীবাদী সংগঠনগুলি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 'কুইনাক্রিন' ড্রাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্যও লড়াই করেছে এমনই কিছু সংগঠন। এমন রোগীদের পাশেও কিছুডাক্তার নেই, তা নয়। 'ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম' - এর মতো কিছু কিছু ডাক্তারদের সংগঠন রোগীদের স্বার্থে কথা বলে আসছে দীর্ঘকাল। কিন্তু এঁরা সেই ব্যতিক্রম, যাঁদের দেখলে নিয়মের সঙ্গে কনট্রাস্ট -টা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুঃখের কথা এই যে, নতুন, দামী, অপ্রমাণিত, ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ ডাক্তাররা স্বচ্ছন্দে লিখে দিচ্ছেন রোগীদের। আমাদের হাসপাতালে, নার্সিং হোমে, ওষুধের দোকানে, 'প্রেসক্রিপশন অডিট' বা প্রেসক্রিপশনের সমীক্ষা হয় না বললেই চলে। যদি হত, তা হলে বোঝা যেত রোগীর প্রতি ডাক্তারের মমত্ববোধ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

অথচ এমন মমতায় সম্পর্কের জন্য মানুষ যে কতটা লালায়িত, তা প্রমাণ করে সাম্প্রতিক একটি ছবি, 'মুন্নাভাই এম বি বি এস'। এক গুণ্ডা, লাফাংগা 'ডন' -এর ডাক্তার হতে চাওয়ার কাহিনী। ডাক্তারির বিজ্ঞান সে কিছুই রপ্ত করে না, কিন্তু রোগীদের সহেগ তার আন্তরিক ব্যবহার, তার স্বাভাবিক স্ফূর্তি, সকলকে মুগ্ধ করে। রোগীকে 'সাবজে*' বলতে সে নারাজ, প্রত্যেককে সে নাম ধরে ডাকতে চায়। ক্যারাম খেলে সে ডিপ্রেশনের বৃদ্ধ রোগীর জীবনে স্পৃহা ফিরিয়ে আনে। যে যুবক ক্যান্সারগ্রস্ত, যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, হাসপাতালের নিয়ম ভেঙে তার জন্য মুন্না ওয়ার্ডে নিয়ে অসে লাস্যময়ী নারী।

মনে হতে পারে বাড়াবাড়ি। মনে হতে পারে, নেহাত বলিউডি গল্প। কিন্তু সমাজ তা বলে না। রোগীরা কীসে সন্তুষ্ট হন, তা নিয়ে বহু সমীক্ষা হয়েছে গত কয়েক দশক। এমন বেশ ইভ্যালুয়েশনস অফ জেনারাল প্র্যাকটিস'। ইউরোপের সব দেশের রোগীরাবলছেন, ডাক্তারদের থেকে প্রত্যাশার এক নম্বরে রয়েছে 'মানবিকতা।' এরপর যথাক্রমে দক্ষতা, রোগীর সঙ্গে আলোচনা, আর রোগীকে সময় দেওয়া (বি এম জে সম্পাদকীয়, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০২)। সময়ের বিষয়টা বারবারই ঘুরে ফিরে আসে রোগীর কথায়। এই বছরই আমেরিকার বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিকের একটি সমীক্ষায় ফল প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে রোগীরা বলছেন, যে ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি করেন, তাঁরা 'ভাল ডাক্তার' নন। ইউরোপের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, স্কটল্যান্ডের রোগীরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এমন ডাক্তার পাওয়ার উপর, 'যিনি আমাকে তাড়া না দিয়ে আমার কথা শোনেন।' সেই সঙ্গে, রোগীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টির কথাও রোগীদের পছন্দের লিস্টের উপরে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সন্তুষ্টির অনেকটাই নির্ভর করছে এই বিষয়টির উপর। আস্থা তাঁদের কাছে খুব জরুরি, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে আস্থাকে এক করে দেখতে রাজি নন রোগীরা। ডাক্তারের সততা, খোলাখুলি কতা বলা, রোগীর প্রয়োজনের দিকে তাঁর নজর, এগুলো রোগীদের কাছে জরুরি। ডাক্তাররা ভাল চিকিৎসার জন্য কোন জিনিসগুলিকে প্রধান মনে করেন, আর রোগী কোনগুলিকে প্রধান মনে করে, এ দুটির মধ্যে অনেক ফারাক রয়ে যাচ্ছে, তা বারবার ধরা পড়ছে সমীক্ষায়। যেমন নেদারল্যান্ডসে রোগীরা মনে করছেন, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের অ্যাপয়েমেন্ট পাওয়া আর যথেষ্ট সময় ধরে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা, এই দুটোই সবচেয়ে জরুরি। আর ডাক্তাররা বলেন, রোগীর চিকিৎসা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডাক্তারের রোগীর বাড়িতে ভিজিট করাই হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। বারবার প্রত্যাশায় এই ফারাক থেকে যাওয়ার এই ছবি ঘুরে ঘুরে আসার ফলে, ডাক্তারি পড়াশোনার মধ্যেই রোগীর সঙ্গে কথাবার্তার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টামূলত 'পাবলিক রিলেশন' বা জনসংযোগধর্মী কাজ। কী করে কথাবার্তায় 'ক্লায়েন্টকে' আরেকটু খুশি করা যায়, উদ্দেশ্যটা সেখানেই আটকে যায়। বড়জোর ডাক্তারের পেশাদারিত্বের ধারণায় নৈতিকতার বিষয়টিকে আরও একটু প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডাক্তার - রোগী সম্পর্ক নিয়ে চিন্তার কোনও মৌলিক পরিবর্তনের সূত্র তাতে পাওয়া যাবে না।

মুন্নাভাই এম বি বি এস ছবির যা মূল বক্তব্য, সহৃদয় ব্যবহার অসাধ্য রোগকেও সারাতে পারে, তা হয়তো ফ্যান্টাসি। কিন্তু অনেক বড় একটা সত্যের ইঙ্গিতও তো পাওয়া যায় - চিকিৎসা কেবল রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসা। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রও এ সত্য স্বীকার করে। হিপোক্রেটিসের শপথ এ যুগে ঠিক খাপ না খাওয়ার (সেখানে সার্জারি করতে নিষেধ আছে, গর্ভপাতকে অনৈতিক বলা হয়েছে) অনেক সেই শপথের নতুন সংস্করণ তৈরি করেছেন। আমেরিকার টাফট্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৪ সালে লিখিত এমনই একটি শপথ বলছে, 'আমি মনে রাখব, আমি একটা ফিভার চার্টের চিকিৎসা করছি না, ক্যান্সারের টিউমারের চিকিৎসা করছি না, একজন অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করছি, যাঁর অসুস্থতা তাঁর পরিবারকে, তাঁর আর্থিক অবস্থাকে, বিপর্যস্ত করতে পারে। রোগীরচিকিৎসা করতে চাইলে এই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।' এমন শপথ এ দেশে কোনও মেডিক্যাল ছাত্র গ্রহণকরেন কি না বলা কঠিন। মুখে করলেও মনে করেন না অনেকেই। সেই জন্যই রোগীদের সন্দেহ বেড়ে উঠেছে যে, রোগীর রোগেরআন্দাজ করার আগে তার পকেটের আন্দাজ করছেন ডাক্তাররা। রোগীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিমা আছে তো? আপনার পরিবারে কে কে চাকরি করেন?' দেখেশুনে তারাপদ রায়ের সেই গল্প মনে পড়ে যায়। সঠিক কথাগুলি মনে নেই আর, কিন্তু তার মূল বক্তব্য এই রকম। এক ডাক্তারের বাড়িতে একজন দেখা করতে এসেছেন, দরজা খুলেছে ডাক্তারের বালিকা কন্যা। ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে মেয়েটি জানালা, 'বাবার আজ ফিরতে দেরি হবে। একটা অ্যাপেনডি' আছে, তারপর একটা ফিসচুলা, তারপর একটা স্লিপ ডি' ...' আগন্তুক ভদ্রলোক চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এই সব নামের মানেজানো?' মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'জানব না কেন, ফিসচুলা মানে আট হাজার টাকা, অ্যাপেনডি' মানে বার হাজার, স্লিপ ডি' মানে পনের হাজার...'

ডাক্তার - রোগীর সংঘাতের বিষয়টা নিয়ে আরও গভীর ভাবে চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কেবল মা'বাদী দৃষ্টিতে নয়, কারণ বিশ্বায়ন - বিরোধিতায় আটকে থাকলে আলোচনা খুব বেশি এগোতে চায় না। আজকের সমাজে, যখন রাষ্ট্র সরে আসছে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা থেকে, অথচ স্বাস্থ্যবিমা সমাজের উপরতলায় আটকে আছে, যখন বিজ্ঞানের গবেষণার রাশ কেড়ে নিতে চাইছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, যখন ডাক্তারের সামনে প্রলোভনের হাতছানি বেশি, রোগীর প্রতি সততা প্রায় মূর্খামি, যখন বিত্ত প্রতি মুহূর্তেত মেধাকে গ্রাস করার উপক্রম করেছে, চিকিৎসার প্রযুক্তি চিকিৎসায় মানবতার স্পর্শকে প্রায় অপ্রয়োজনীয় করে তুলছে, তখন কেবল দায়বদ্ধতার কথা ভেবে রোগীর পাশের চেয়ারটিতে বসার সময় থাকবে কার? রোগীর প্রতি নৈতিক ব্যবহারের পুরস্কার কি ডাক্তারকে দেবে সমাজ? রোগীর অধিকার, ডাক্তারের দায়, এই ধারণার নিরিখে আলোচনা এগিয়েছে এতদিন। কিন্তু আজ মনে হয়, এবার নতুন কোনও মাত্রা যোগ করার দরকার হয়ে পড়েছে। আজ বড় প্রয়োজন নতুন কোনও দার্শনিকের, যিনি চিকিৎসক রোগীর সম্পর্কের এই সঙ্কট একবিংশ শতাব্দীর 'বিশ্বায়িত সমাজের' নিরিখে বিচার করবেন। নতুন কোনও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে বলবেন, কেমন করে ভাবতে হবে প্রাচীন এই সম্পর্ক নিয়ে, আর সেই সম্পর্ক থেকে আমাদের প্রত্যাশাকে। সংঘাত যতই থাক। যেদিন ব্যধিগ্রস্থ মরাণাপন্ন দেহকে গোটা সমাজ ত্যাগ করে যান, তখন আশা থেকে যায় কেউ একজন থাকবেন শিয়রে। তিনিই ডাক্তার। জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত রোগীকে মানুষের মর্যাদা দিতে পারেন তিনিই। দারা - পুত্র - পরিবারের স্নেহবন্ধনের চেয়েও এই বন্ধন কোথায় যেন আরও গভীর, আরও মানবিক। ডাক্তার - রোগীর সম্পর্ক নিয়ে বারবার চিন্তা না করে তাই উপায় নেই।